ইউনিট
১০

মানবদেহের প্রতিরক্ষা
DEFENCE OF HUMAN BODY

মানবসমাজ বাসস্থান ও পরিবেশে থেকে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণুর সংস্পর্শে আসে। দেহের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এসব জীবাণুর বিভিন্ন পযার্য়ের দেহে প্রবেশকে প্রতিহত করে। দেহের সব রকম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা যা ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে মানুষকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার সম্পর্কে সংক্ষেপে এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১ : প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১০.২ : প্রতিরক্ষার স্তরসমূহ
পাঠ ১০.৩ : সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
পাঠ ১০.৪ : প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি
পাঠ ১০.৫ : প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার (Vaccine) ভূমিকা

পাঠ-১০.১ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	ইমিউনিটি, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, কলা ও কোষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে একত্রে দেহের প্রতিরক্ষা (defence) ব্যবস্থাপনায় কোন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে মানুষকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে বলা হয় ইমিউনিটি (immunity)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, কলা ও কোষ সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে ইমিউন তন্ত্র (immune system) বলা হয়। রোগ প্রতিরোধে ইমিউনিটির প্রধান উদ্দেশ্য তিন প্রকারের। যথা- ১। অণুজীবদের (micro-organisms) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ২। দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলোকে শনাক্ত করা ও প্রতিস্থাপিত করা এবং ৩। পরিত্যক্ত বা নষ্ট কোষগুলোকে শনাক্ত করা এবং তাদের ধ্বংস করা।

মানবদেহে প্রধাণত লিম্ফয়েড অঙ্গ ও শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো দেহের প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ইমিউন তন্ত্রের লিম্ফয়েড অঙ্গগুলো প্রাথমিক বা মুখ্য ও গৌন অঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

১। প্রাথমিক বা মুখ্য লিম্ফয়েড অঙ্গ (Primary lymphoid organs)

ক. লসিকা গ্রন্থি (Lymph nodes): লসিকা বহনকারী লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে। দেহের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত, তবে ঘাড়ে, বগলে, কুঁচকিতে লসিকা গ্রন্থির পরিমাণ বেশি।

খ. লসিকা (Lymph): লসিকা বর্ণহীন ও রক্তের ন্যায় এক ধরনের যোজক কলাবিশেষ। লসিকানালির মধ্য দিয়ে ঈষৎ ক্ষারধর্মী যে তরল যোজক কলা বা লসিকা প্রবাহিত হয় তাই লসিকা।

গ. লসিকানালি (Lymphatic vessels): দেহের সর্বত্র বিস্তৃত নালিকা যেগুলো লসিকা পরিবহন করে।

ঘ. থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland): শ্বাসনালির পিছনে অবস্থিত গ্রন্থি।

ঙ. অস্থিমজ্জা (Bone marrow): অস্থি গহ্বরে অবস্থিত লোহিত বর্ণের নরম ও চর্বিযুক্ত কলা।

২। গৌন লিম্ফয়েড অঙ্গ (Secondary lymphoid organs):

ক. প্লিহা (Spleen): উদর গহ্বরে পাকস্থলীর পাশে অবস্থিত লালচে বর্ণের মুষ্ঠি আকারের গঠন।

খ টনসিল (Tonsils): গলার পিছনের দিকে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন।

গ. পেয়ার প্যাচ (Peyer's patches): ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের লসিকা কলা।

দেহের রোগ মুক্তিতে ইমিউন তন্ত্র রস নির্ভর ও কোষ নির্ভর সহজাত প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে।

ইমিউন তন্ত্র দেহের রস নির্ভর সহজাত প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

১। কমপ্লিমেন্ট- ১১টির বেশী সিরাম প্রোটিনের সমন্বয়ে জীবাণু সংক্রমন রোধে কাজ করে।

২। লাইসোজাইম- ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ধবংস করে।

৩। ইন্টারফেরন- এক ধরনের প্রোটিন যা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করে।

ইমিউন তন্ত্র সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোষগুলো-

১। দেহের বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা কোষগুলো সহজাত প্রতিরক্ষায় জড়িত। সেগুলো হলো-

ক. গ্রানুলার লিউকোসাইট (Granular leukocytes): রক্তে অবস্থিত নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল।

খ. মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট (Mononuclear phagocytes) : দু'রকমের দেখা যায়। যথা- মনোসাইট এবং ম্যাক্রোফেজ। মনোসাইট রক্তে অবস্থিত এক প্রকার শ্বেতকণিকা। এরা ফ্যাগাসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। ম্যাক্রোফেজ (macrophage) কোষ বিভিন্ন রকমের হয়। যথা- যকৃতের কুফার কোষ, অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ (alveolar macrophage), অস্টিওক্লাস্ট (osteoclast), যকৃতের মেসেঞ্জিয়াল কোষ (meessengial cell), মস্তিষ্কের মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ (microglial cell) ইত্যাদি।

গ. নাল কোষ ((Null cell): বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট বা কিলার সেল বা ন্যাচারাল কিলার সেল (N.K. cell) নামে পরিচিত।

২। দেহের যেসব কোষ অর্জিত প্রতিরক্ষায় জড়িত সেগুলো হলো-

ক. B-লিম্ফোসাইট (B-lymphocyte) কোষ অ্যান্টিবডির মাধ্যমে রস নির্ভর প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে।

খ. T-লিম্ফোসাইট (T-lymphocyte) অ্যান্টিবডির মাধ্যমে কোষ নির্ভর প্রতিরক্ষা দিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে মুখ্য লিম্ফয়েড অঙ্গের নাম লিখুন			

সারসংক্ষেপ

মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, কলা ও কোষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে একত্রে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ থেকে মানুষকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে বলা হয় ইমিউনিটি। রোগ প্রতিরোধে ইমিউনিটির প্রধান উদ্দেশ্য তিন প্রকারের। ইমিউন তন্ত্রের লিম্ফয়েড অঙ্গগুলো প্রাথমিক ও গৌন অঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রাথমিক বা মুখ্য লিম্ফয়েড অঙ্গ- লসিকা গ্রন্থি, লসিকা, লসিকানালি, থাইমাস গ্রন্থি ও অস্থিমজ্জা। গৌন লিম্ফয়েড অঙ্গ- প্লিহা, টনসিল ও পেয়ার প্যাচ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধের মূল ধরণ কয়টি?

ক. ২টি　　খ. ৩টি

গ. ৪টি　　ঘ. কোনটি নয়

২। কোনটি অর্জিত প্রতিরক্ষার অংশ?

ক. মনোসাইট　　খ. T-লিম্ফোসাইট

গ. ম্যাক্রোফেজ　　ঘ. নাল কোষ

পাঠ-১০.২ প্রতিরক্ষার স্তরসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাক নালীর এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ (Macrophage) ও নিউট্রোফিল (Neutrophil) এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	মেলানিন, ম্যাক্রোফেজ

আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য জীবাণুর বসবাস। এ জীবাণুদের মধ্যে একটি অংশ আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। অসংখ্য জীবাণুদের মাঝে বসবাস করেও আমরা কিন্তু সুস্থ থাকি। কারণ আমাদের দেহে রয়েছে তিন স্তরের রোগ প্রতিরোগ ব্যবস্থা। রোগজীবাণু কিংবা পরজীবী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মানবদেহে সাধারণভাবে তিন ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়।

প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর

এ প্রতিরক্ষার প্রথম স্থরে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো জীবাণু প্রতিরোধ করে থাকে-

১। ত্বক (Skin): ত্বক দেহে অণুজীব প্রবেশের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ত্বকীয় গ্রন্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বরূপ। ত্বকে বিদ্যমান মিথোজীবী অণুজীব সংক্রামক অণুজীব প্রতিরোধ করে।

২। সিলিয়া ও মিউকাস (Cilia and Mucus): শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও অণুজীবদের হাঁচি (sneezing) ও কাশির (Coughing) মাধ্যমে বের করে দেয়।

৩। এসিড (Acid) : পাকস্থলীতে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) খাদ্যের সঙ্গে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে। যোনিতে বিদ্যমান মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে।

৪। লাইসোজাইম এনজাইম (Lysozyme enzyme): লালা, অশ্রু, মূত্র ও ঘামে বিদ্যমান লাইসোজাইম এনজাইম দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব ধ্বংস করে।

৫। রক্ত জমাট (Blood clotting): ক্ষতস্থানে দ্রুত রক্ত তঞ্চন ঘটে দেহে অণুজীব প্রবেশ রোধ করে।

সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত এই প্রতিরক্ষা স্তরে দেহের ত্বক, পরিপাকনালির এসিড এবং এনজাইমের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা- ত্বক প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ত্বক দেহকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং প্রভাবে সৃষ্ট রোগ (ক্যান্সার) হতে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের এপিডার্মিসের কোষে মেলালিন (melanine) জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় যা অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। ত্বক দেহের বাইরের স্তরে দৃঢ় ও কেরাটিনাইজড (keratinized) আবরণী তৈরি করে, যা দেহের সকল বাহ্যিক অংশকে আচ্ছাদিত করে এবং ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ফলপ্রসূ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেহত্বক ছিঁড়ে গেলে বা কেটে গেলে ত্বকে অবস্থিত হিস্টিওসাইট (ম্যাক্রোফেজ) জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে প্রতিরক্ষা দান করে। ঘাম ও তৈল গ্রন্থির নিঃসরণ ত্বকের উপরিভাগের pH-কে অম্লীয় (pH= 3-5) করে তোলে, ফলে অণুজীবসমূহ বেশি সময় ত্বকে বেঁচে থাকতে পারে না। কিছু সংখ্যক উপকারী ব্যাকটেরিয়া ত্বকে অবস্থানকালে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য নিঃসরণ করে, যা অণুজীবের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাঁধা দেয়। ঘাম নিঃসৃত লবণ ও ফ্যাটি এসিডে অবস্থিত লাইসোজাইম (lysozyme) ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরকে ধ্বংস করে। অশ্রুগ্রন্থি নিঃসৃতেও লাইসোজাইম থাকে যারা চোখে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত করে।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা- লালারসের লাইসোজাইম এনজাইম খাদ্য-পানীয়তে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের অভ্যন্তরে বা দাঁতে খাদ্যকণা সঞ্চিত হতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে।

আর যেসব ব্যাকটেরিয়া লালারস দ্বারা ধ্বংস হয় না তারা পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত HCl এসিড দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীরসে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান লাইসোজাইমও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর

শ্বেত রক্তকণিকা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি), প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া (inflammatory response) ও দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রভৃতি দেহে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ফ্যাগোসাইটিক কোষ- দেহের প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোনো কারণে অকার্যকর হয়ে পড়লে ব্যাকটেরিয়া ত্বকের ক্ষতস্থান দিয়ে দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের সূক্ষ্ম রক্তনালিকাগুলোর প্রসারণের ফলে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কৈশিক জালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধির ফলে ফ্যাগোসাইটগুলো (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল, মনোসাইট ইত্যাদি) আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বের হয়ে আসে এবং অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়াকে গলাধঃকরণ করে।

প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া- সংক্রমিত স্থানে উৎপন্ন পুঁজ (pus) হচ্ছে রক্তরসে অবস্থিত মৃত কোষ, নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ। ফ্যাগোসাইটোসিসের (phagocytosis) পরিণতি প্রকাশ পায় যখন সংক্রমণের স্থানটি গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে স্ফীত হয়। রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ত্বকের ওই অঞ্চলে লালচে ভাব ফুটে ওঠে।

লসিকাবাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইট লসিকা গ্রন্থিতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে গলাধঃকরণের মাধ্যমে নিষ্কাষিত করে। লিম্ফোসাইট ও ক্ষতিগ্রস্থ কলা নিঃসৃত হিস্টামিন (histamin) এরপ প্রভাবে রক্তের কৈশিক জালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রদাহ সৃজনক্ষম প্রতিক্রিয়া (inflammatory response) দেখা যায়।

দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপমাত্রা হচ্ছে অণুজীব ও শ্বেতকণিকার মধ্যকার সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের প্রদাহ অধিকতর বিস্তৃত এবং একে Systemic reaction বলে। উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর শুধু জীবাণুর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে তা নয়, কখনো কখনো এরা আসলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও ক্রিয়াশীল করে তোলে বটে, অবশ্য যদি না তা অতিরিক্ত পর্যায়ের অসুবিধা ঘটায়। এক্ষেত্রে দুটি কারণে জ্বর হয়ে থাকে। প্রথমত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দ্বারা নিঃসৃত বিষক্রিয়া, দ্বিতীয়ত পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ (fever producing substance) যা শ্বেতকণিকা থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলসের ভূমিকা

মাক্রোফেজ (Macrophage)- ম্যাক্রোফেজ বিশেষ প্রকার শ্বেতকণিকা, যা মনোসাইট (monocyte) থেকে উৎপন্ন হয়। মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম (Reticulo-endothelial system) বা মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট সিস্টেমের (Mononuclear phagocyte system) ভিতর (যেমন- অস্থিমজ্জা, যকৃৎ, প্লিহা, লিম্ফ নোড ও সাইনাসের ভিতর) ম্যাক্রোফেজ ঘুরে বেড়ায়। এমনকি ভ্রাম্যমাণ কোষ (wandering cells) হিসেবেও এরা কলার ভিতর বিচরণ করতে পারে। যেমন- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভিতর মাইক্রোগ্লিয়া (microglia), যকৃৎ রক্তনালির ভিতর কুফার কোষ (Kuffer cell), যোজক কলার মধ্যে আবদ্ধ হিস্টিওসাইট বিভিন্ন প্রকার ম্যাক্রোফেজ।

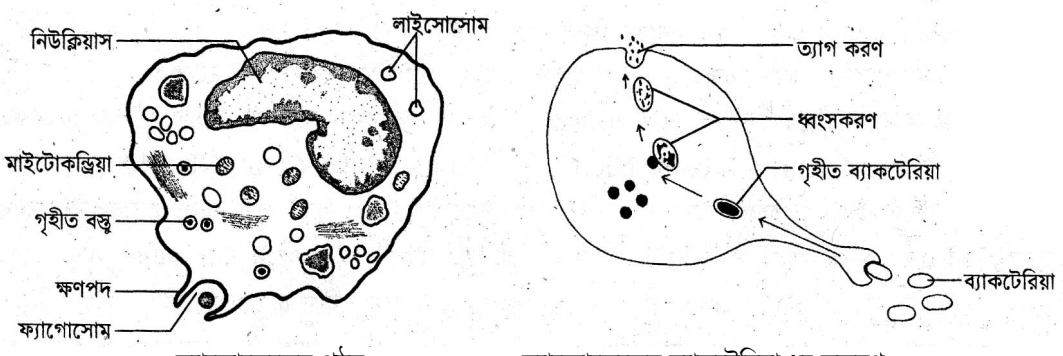

ম্যাক্রোফেজের গঠন ম্যাক্রোফেজের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকরণ

চিত্র ১০.২.১: মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ম্যাক্রোফেজ

এধরনের কোষ, জীবাণুকে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) পদ্ধতিতে আত্মাসাৎ করে জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এটা ছাড়াও B ও T লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে ইমিউনিটি সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। ম্যাক্রোফেজগুলো প্রাথমিকভাবে দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। তা ছাড়াও ইমিউনিটি সৃষ্টিতে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।।

দেহত্বক ভেদ করে রোগ জীবাণু কোষ কলায় পৌঁছানো মাত্রই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ফলে দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধীরে ধীরে উক্ত প্রদাহস্থলে ম্যাক্রোফেজ এসে জড়ো হতে থাকে। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিন দু'ভাবে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। যেমন-

(ক) ভৌত পদ্ধতিতেঃ ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহ প্রাচীরে গর্ত বা ছিদ্র করে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে।

(খ) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়ঃ যে প্রক্রিয়ায় শ্বেত রক্ত কণিকাসমূহ অণুজীব ভক্ষণ করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে। ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহের বাইরের দিকে আঠার মতো লেগে থেকে অন্যান্য ম্যাক্রোফেজকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নিধন চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. কেমোট্যাক্সিসঃ প্রথমে ম্যাক্রোফেজ কেমোট্যাক্সিস প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়।

২. সংলগ্নীকরণ: অতঃপর ব্যাকটেরিয়া ও ম্যাক্রোফেজ নিকটবর্তী হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে। একে সংলগ্নীকরণ বলা হয়। ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা আবরণীর কিছু রাসায়নিক গ্রাহক পদার্থ অণুজীবদের সাথে সংযুক্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়া শুরু করে।

৩. গ্রাসকরণ: ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য রোগ জীবাণুকে দেহাভ্যন্তরে টেনে নেয় বা গ্রাস করে। অর্থাৎ এ সময়ে ম্যাক্রোফেজ অণুজীবের চারদিকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এটিকে ঘিরে ফেলে এবং পরিশেষে ইনভ্যাজিনেশন প্রক্রিয়া সাইটোপ্লাজমের ভিতরে নিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়াকে ইনজেশন বা গ্রাসকরণ বা ভক্ষণ বলে। দেহাভ্যন্তরে প্রবেশের পর জীবাণুর এ দশাকে ফ্যাগোসোম (phagosome) বলে।

৪. হত্যা ও পরিপাক: ফ্যাগোসোম ম্যাক্রোফেজের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত লাইসোজাইম (lyozyme) এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফ্যাগোলাইসোজোম (phagolysome) তৈরি করে। ফ্যাগোলাইসোজোম তৈরি হওয়ায় ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে উক্ত এনজাইমের প্রভাবে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর মৃত ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকোষীয় পরিপাক (যেমন- লাইসোজাইম, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ ও গ্লাইকোলাইসিস প্রভৃতির ক্রিয়ার পরিপাক) সম্পন্ন হয় এবং অপাচ্য অংশ বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ম্যাক্রোফেজের ইমিউনিটিতে সাড়াদান

ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ ছাড়াও ম্যাক্রোফেজ B ও T লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে ইমিউনিটি মূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে ইমিউনিটি সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের প্লাজমা পর্দায় MHC (Major Histocompatibility Complex) নামক প্রোটিন থাকে। ম্যাক্রোফেজ নিজের MHC প্রোটিনের দেহের অন্যান্য কোষের MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে আপন কোষগুলোকে শনাক্ত করতে পারে।

বহিরাগত কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে প্রোটিনের উপস্থিত সাপেক্ষে ম্যাক্রোফেজ তাদের চিনতে পারে। ভাইরাস ও অন্যান্য বহিরাগত বিষাক্ত পদার্থও এদের দ্বারা চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, MHC প্রোটিন MHC জিন দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং আঙুলের ছাপের মতো একজনের MHC প্রোটিনের সঙ্গে অপরের প্রোটিনের কোনো মিল পাওয়া যায় না। বহিরাগত জীবাণু, পরজীবী কোষ বা ভাইরাস প্রভৃতি ম্যাক্রোফেজের সংস্পর্শে এলে ম্যাকোফেজ হতে ইন্টারলিউকিন-1 (interleukin-1) নামক প্রোটিন নিঃসৃত হয় এবং উহার প্রভাবে লিম্ফোসাইট কোষগুলো উদ্বুদ্ধ হয়ে অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগায়।

এছাড়া ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে জীবাণু পাচিত হলে উহার কিছু প্রোটিন (অ্যান্টিজেন) ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা পর্দায় MHC প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ অবস্থায় এটি লিম্ফোসাইট কর্তৃক চিহ্নিত হয় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নিউট্রোফিলস ইমিউনিটিতে সাড়াদান

নিউট্রোফিল মানবদেহের সহজাত রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। মানুষের রক্তে যে শ্বেত রক্তকণিকা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলো নিউট্রোফিল (৬০-৭০%)। নিউট্রোফিল প্রধাণত তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া নিধন করে। যথা-

১। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়: ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ফ্যাগোসাইটিক নিউট্রোফিলস কলাকোষের মধ্য দিয়ে দেহের যেকোনো অংশে প্রবেশ করতে পারে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এ কাজে লিম্ফোসাইট থেকে নিঃসৃত হরমোন সৃদশ রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- ইন্টারলিউকিন, লিউকোট্রিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব রাসায়নিক পদার্থকে সাইটোকাইনস (cytokines) বলে। সাইটোকাইনসের প্রভাবে রক্ত নালিকা প্রসারিত ও ছিদ্রময় হয়ে ওঠে। ফলে নিউট্রোফিল এসব ছিদ্র দিয়ে রক্ত জালিকায় অন্তরাবরণীয় আস্তরণের যেকোনো একটি সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে এ কোষগুলো মুহূর্তে তাদের প্রোটোপ্লাজমীয় ক্ষণপদ (pesudopodium) প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং প্রোটোপ্লাজমের অর্ধতরল পদার্থকে ক্ষণপদের দিকে ঠেলে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়।

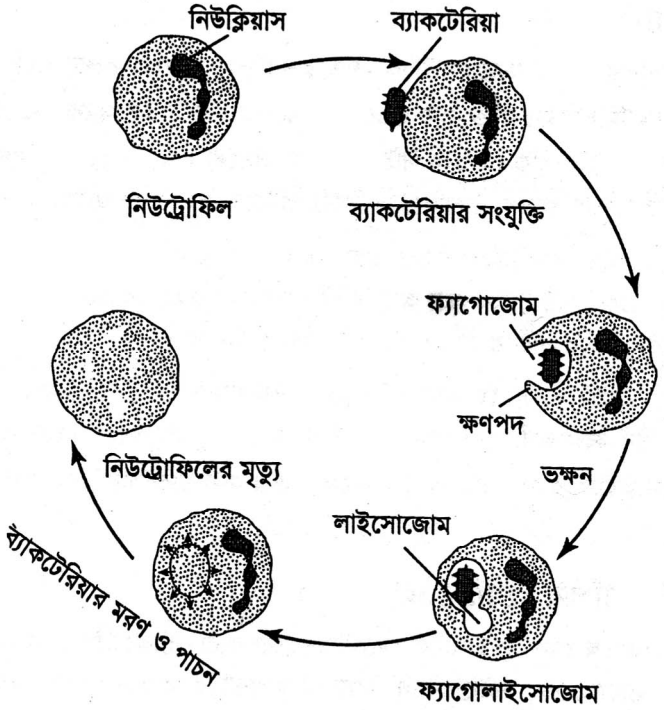

চিত্র ১০.২.২: ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া

এ পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের (প্রায় ১মিনিট) মধ্যেই অসংখ্য রক্ত কণিকা রক্ত প্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দেহের যে অংশে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশে করে সেখানে পৌঁছেই তারা বিপদাপন্ন অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে শুরু করে। প্রতিটি কোষ প্রায় ১৫-২০টি রোগ জীবাণু গ্রাস করতে সক্ষম। এদের জীবন্ত অবস্থায়ই তারা গ্রাস করে।

২। প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা: ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও নিউট্রোফিল প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (যেমন- লেকটোফেরিন, লাইসোজাইম, কোলাজিনেজ, ক্যাথিলিসিডিন ইত্যাদি) নিঃসরণ করে যা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গিলে ফেলা জীবাণুর (ফ্যাগোসোম) সঙ্গে মিশে গিয়ে ফ্যাগোলাইসোজোম তৈরি হয়, যেখানে রোগজীবাণু মারা পড়ে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩। ভৌত পদ্ধতিতে : এ পদ্ধতিতে নিউট্রোফিল রক্ত নালির মধ্যে DNA গঠনের অনুরূপ জালকাকৃতির এক ধরনের বহিঃকোষীয় ফাঁদ (Neutrophil Extracellular Traps-NETs) তৈরি করে ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করে। নিউট্রোফিল, প্রোটিন (সিরাইন প্রোটিয়েজ) ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত জালে ব্যাকটেরিয়া আটকা পড়ার পর সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ এ পদ্ধতি ভৌত উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে।

তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third line of defence)

ইমিউনিটি জনিত সাড়া (immune response) তৃতীয় স্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং এটি নির্দিষ্টভাবে (In specific) প্রতিরক্ষা প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জীবাণু বা পরজীবীর বিরুদ্ধে কিংবা বিশেষ কোনো অ্যান্টিজেন প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থায় ভিন্ন রকমের প্রতিহত পন্থা দেখা যায়।

১। সহজাত ইমিউনিটি (inborn or innate or natural immunity)- যে ইমিউনিটি জন্মের সময় থেকে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালিত হয় এবং দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম, তাকে সহজাত ইমিউনিটি বলে। এ রকম ইমিউনিটি জন্মগত। এটি বিশেষ কোনো রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নয়। এটি দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা জন্ম থেকেই রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী।

উদাহরণ- ত্বক, মিউকাস পর্দা, পাকস্থলীর আম্লিক pH, ক্ষরিত লালারস, চোখের পানি, শ্বসনতন্ত্রের সিলিয়া, রক্ত কণিকা (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল) প্রভৃতি দ্বারা এই ইমিউনিটি রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

২। জিনগত ইমিউনিটি (genetic immunity)- জিনগত গঠনের ভিত্তিতে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় বলে এটিকে বংশগত বা জিনগত ইমিউনিটি বলা হয়। এই ইমিউনিটি বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আংশিকভাবে বা জীবাণুর সম্পূর্ণভাবে পোলিও, হাম, কলেরা, আমাশয়, ভাইরাসজনিত পক্ষাঘাত, মাম্পস, সিফিলিস প্রভৃতিকে রোধ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল-এর মধ্যকার পার্থক্যগুলো লিখুন।

ম্যাক্রোফেজ	নিউট্রোফিল

সারসংক্ষেপ

রোগ জীবাণু কিংবা পরজীবী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মানবদেহে সাধারণভাবে তিন ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর- ত্বক, সিলিয়া ও মিউকাস, এসিড, লাইসোজাইম এনজাইম ও রক্ত জমাট। দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর- শ্বেত রক্তকণিকা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি), প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া ও দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রভৃতি দেহে দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিন দু'ভাবে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। যেমন- ভৌত পদ্ধতি ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নিধন চারটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা- কেমোট্যাক্সিস, সংলগ্নীকরণ, গ্রাসকরণ ও হত্যা এবং পরিপাক। নিউট্রোফিলস প্রধাণত তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া নিধন করে। যথা- ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা ও ভৌত পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তরে ভূমিকা রাখে কোনটি?

(ক) ত্বক (খ) ম্যাক্রোফেজ (গ) নিউট্রোফিল (ঘ) অ্যান্টিজেন

২। ইন্টারফেরন এক ধরনের কী?

(ক) কার্বোহাইড্রেট (খ) লিপিড (গ) গ্লাইকোপ্রোটিন (ঘ) সেলুলোজ

পাঠ-১০.৩ সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	ইমিউনিটি, লাইসোজাইম

সহজাত ইমিউনিটি প্রতিরোধ গড়ার পদ্ধতি- এ ধরনের ইমিউনিটি নিম্নলিখিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে-

১। আগ্রাসন ভোজন (Phagocytosis) : রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের আগ্রাসন কোষ, রক্তের মনোসাইট, নিউট্রোফিল, যকৃতের ফুফার কোষ, সংযোগী কলার হিস্টিওসাইট, প্লিহা, লসিকাগ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থির জালককোষ সক্রিয় আগ্রাসন পদ্ধতিতে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। এ ছাড়া প্রদাহ স্থানে আগ্রাসক কোষ প্রবেশ করে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে।

২। এসিড ও উৎসেচক: পাকস্থলীতে গৃহিত জীবাণু পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পাচক উৎসেচক দ্বারা বিনষ্ট হয়।

৩। ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি: ত্বক তার কঠিন বহিঃস্তরের মাধ্যমে দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশে বাধা প্রদান করে। নাসিকার মিউকাস স্তর রোগ জীবাণুকে মুখবিবরে লালার মধ্যে ঠেলে দেয়। তখন রোগ জীবাণু গলাধঃকৃত হয়ে পাকস্থলীতে আসে এবং এসিডের সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়।

৪। রক্তস্থিত রাসায়নিক পদার্থ: রক্তের কিছু রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু বিনাশে অংশগ্রহণ করে। যেমন-

লাইসোজাইম: এটি এক রকম মিউকোলাইটিক পলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ, যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

বেসিক পলিপেপটাইড: এই পদার্থটি কোনো কোনো গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও তাদের নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট করে।

প্রোপারডিন: এটি একটি বৃহদাকার প্রোটিন যা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো বিনষ্ট করে।

অ্যান্টিবডি: এরা রক্তের স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এরা উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও প্রতিবিষকে ধ্বংস করে।

প্রাকৃতিক কিলার সেল: এরা এক ধরনের লিম্ফোসাইট, এরা বিভিন্ন বিজাতীয় কোষ, টিউমার কোষ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে।

সহজাত ইমিউনিটি-তন্ত্রের প্রধান কাজ- মেরদণ্ডী প্রাণীর দেহে সহজাত ইমিউনতন্ত্রের প্রধান কাজগুলো হলো-

১। সংক্রমণ স্থানে অনাক্রম্য কোষগুলোকে নিযুক্ত করে সাইটোকাইনস (cytokines)-এর মতো রাসায়নিক দূত উৎপাদন করা।

২। কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রকে সক্রিয় করে ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করা এবং মৃত কোষ পরিস্কার করা।

৩। অঙ্গ, কলা বা লসিকাতে উপস্থিত বহিরাগত বস্তুগুলোকে বিশেষ শ্বেতরক্তকণিকা দিয়ে শনাক্ত করা ও বর্জন করা।

৪। অর্জিত ইমিউন তন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলা।

অর্জিত ইমিউনিটি বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

যেসব ইমিউনিটি সহজাত নয়, জন্মের পর দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশের ফলে সৃষ্টি হয় তাদের অর্জিত ইমিউনিটি বলে। এ রকম ইমিউনিটি প্রাণীর জন্মের পর অর্থাৎ প্রাণির জীবদ্দশায় অর্জিত হয়। কোনো ক্ষতিকর অণুজীব কিংবা ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে দেহে এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দেহের প্রয়োজনে যে ইমিউনিটি আবির্ভাব ঘটে সেটাই হচ্ছে অর্জিত ইমিউনিটি। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়-

১। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে-

ক. কোষনির্ভর ইমিউনিটি বা কোষ নিয়ন্ত্রিত ইমিউনিটি (Cellular immunity or Cell mediated immunity)- দেহের যে ইমিউনিটি T-লিম্ফোসাইট বা T- কোষের সাহায্যে ঘটে তাকে কোষভিত্তিক ইমিউনিটি বলে। এ ধরনের অর্জিত ইমিউনিটি T-শ্রেণির লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনুপ্রবিষ্ট রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। লোহিত মজ্জা থেকে T-

লিম্ফোসাইট সৃষ্টিকারী কোষ থাইমাস গ্রন্থিতে প্রবেশ করে T-লিম্ফোসাইটে পরিণত হয় এবং লসিকাগ্রন্থিতে আশ্রয় লাভ করে। দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাকে ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে। T-লিম্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজযুক্ত অ্যান্টিজেনকে গ্রহণ করে এবং লিম্ফোকাইনিন এনজাইমের সাহায্যে তাদের ধ্বংস করে।

খ. রসভিত্তিক ইমিউনিটি বা হিউমোরাল ইমিউনিটি বা অ্যান্টিবডি নিয়ন্ত্রিত ইমিউনিটি (Humoral immunity or Antibody mediated immunity)- দেহে যে অনাক্রম্যতা B-লিম্ফোসাইটের B-কোষ এর সাহায্যে ঘটে তাকে রসভিত্তিক ইমিউনিটি বলে। B-লিম্ফোসাইট এ ধরনের ইমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত। রক্তে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করার পর B-লিম্ফোসাইট তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে B-লিম্ফোসাইট কোষ ব্লাস্ট কোষে পরিণত হয় এবং ব্লাস্ট কোষ থেকে প্লাজমা কোষ তৈরি হয়। প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন সৃষ্টি করে।

২। সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে-

(ক) সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ ইমিউনিটি (Active immunity) : মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে (যেমন- মানুষ) এমন কিছু ব্যবস্থা থাকে, যা দেহে জীবাণু অনুপ্রবেশের পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় ইমিউনিটি অন্তর্ভুক্ত। এই অনাক্রম্যতার পরিচায়ক হচ্ছে T-লিম্ফোসাইট দ্বারা জীবাণু দমন কিংবা B-লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি ক্ষরণের মাধ্যমে জীবাণু দমন। এ ইমিউনিটি আবার দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১। প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ সক্রিয় ইমিউনিটি (Naturally acquired active immunity): আমাদের দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে তা অ্যান্টিজেন নামক পদার্থের প্রভাবে রক্তের T ও B-লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে। সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলোর প্রভাবে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত হয়। তাছাড়াও সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মৃতিকোষ (memory cell) সৃষ্টি করে, যেগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন মজুদ থাকে ও ভবিষ্যতে আগের মতো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তাদের সহজে ও দ্রুত দমন করে ফেলে।

২। কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ সক্রিয় ইমিউনিটি (Artificially acquired active immunity): এ রকম ইমিউনিটি প্রতিষেধক প্রয়োগ দ্বারা (vaccination) সৃষ্টি করা যায়। ভ্যাক্সিন (vaccine) বা টিকা হলো নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন (attenuated antigens) দেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলে, নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে দেহের T ও B-লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বিশেষ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থাই জেগে ওঠে।

সক্রিয় ইমিউনিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয়।
২। সক্রিয় ইমিউনিটির প্রভাব সুদূরপ্রসারী।
৩। এ ধরনের ইমিউনিটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পরে উপশম ঘটে।
৪। এ ধরনের ইমিউনিটিতে কোনো পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

(খ) নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ ইমিউনিটি (Passive immunity): এই প্রতিরক্ষা প্রাণী নিজ দেহে সক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি না করে জীবাণু দমনের জন্য অন্য কোনো প্রাণী থেকে অ্যান্টিবডি লাভ করে। এ ধরনের অনাক্রম্যতা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

১। প্রাকৃতিগতভাবে লব্ধ পরোক্ষ/নিষ্ক্রিয় ইমিউনিটি (Artificially acquired passive immunity): মাতৃগর্ভে শিশু অমরার (placenta) মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে অ্যান্টিবডি (IgG) অর্জন করতে পারে ও এর সাহায্যে অপরিণত শিশু জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয়। এটা ছাড়াও শিশু মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে (বিশেষতঃ কলোস্ট্রামের মাধ্যমে) IgG জাতীয় অ্যান্টিবডি প্রাপ্ত হয়। এটা শিশুর দেহে জীবাণু দমনে সহায়তা করে।

২। কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ পরোক্ষ ইমিউনিটি (Artificially acquired passive immunity): এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে অন্য প্রাণীর দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রোগ জীবাণু প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক (vaccine) তৈরি করা হয়। এই প্রতিষেধক দ্বারা মানবদেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টির‍্যাবিজ (antirabies) প্রতিষেধকের ব্যবহার। সাম্প্রতিক সময়ে অধিক শক্তিশালী, নিরাপদ ও উন্নত প্রতিষেধক (vaccine) তৈরির চেষ্টা চলছে। যার একটি সাফল্য হচ্ছে- কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হেপাটাইটিস ভাইরাসের (hepatiites virus) সফল ভ্যাকসিন প্রস্তুত।

নিষ্ক্রিয় ইমিউনিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য

১। যে ইমিউনিটি দেহের বাইরে থেকে কোনো উপাদান দেহে প্রবেশ করিয়ে সৃষ্টি করা হয়, তাকে নিষ্ক্রিয় ইমিউনিটি বলে।
২। নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রভাব স্বল্পস্থায়ী।
৩। এ ধরনের অনাক্রম্যতায় পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

অর্জিত অনাক্রম্যতাতন্ত্রের প্রধান কাজ: মেরুদন্ডী প্রাণিদেহে অর্জিত অনাক্রম্যতাতন্ত্রের প্রধান কাজগুলো হলো-
১। বিশেষ কোষের মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা।
২। একদা সংক্রমিত নির্দিষ্ট জীবাণুকে মনে রাখা ও পরবর্তীকালে সেই জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করা।
৩। জীবাণুর ভবিষ্যৎ আক্রমনের জন্য দেহকে প্রস্তুত রাখা।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে পার্থক্য লিখুন।
কোষভিত্তিক ইমিউনিটি	রসভিত্তিক ইমিউনিটি

সারসংক্ষেপ

সহজাত ইমিউনিটি প্রতিরোধ গড়ার পদ্ধতি- ১. আগ্রাসন ভোজন, ২. এসিড ও উৎসেচক, ৩. ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি ও ৪. রক্তস্থিত রাসায়নিক পদার্থ (লাইসোজাইম, বেসিক পলিপেপটাইড, প্রোপারডিন, অ্যান্টিবডি ও প্রাকৃতিক কিলার সেল)। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো হলো- ১। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. কোষনির্ভর ইমিউনিটি বা কোষ নিয়ন্ত্রিত ইমিউনিটি ও খ. রসভিত্তিক ইমিউনিটি বা হিউমোরাল ইমিউনিটি বা অ্যান্টিবডি নিয়ন্ত্রিত ইমিউনিটি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। লাইসোজাইম কি ধ্বংস করে?
(ক) ছত্রাক (খ) ভাইরাস (গ) ব্যাকটেরিয়া (ঘ) শৈবাল

২। কিসের সংস্পর্শে B লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে?
(ক) অ্যান্টিজেন (খ) অ্যান্টিবডি (গ) ভ্যাক্সিন (ঘ) কোনটিই নয়।

৩। মানবদেহ প্রতিরক্ষা স্তর কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

পাঠ-১০.৪ প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি, এনিটোপ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা

অ্যান্টিজেন (Antigen)- অ্যান্টিজেন হচ্ছে যেকোনো বিজাতীয় প্রোটিন বা পলিস্যাকারাইড, যা প্রাণিদেহে থাকে না। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা এদের নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ অন্যদেহের প্রতিটি কোষে যে প্রোটিন রয়েছে তা নির্দিষ্ট প্রাণিদেহের জন্য অপরিচিত এবং এটিই অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। একটি অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহকে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করে। অ্যান্টিজেন শব্দটি Antibody generating এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যে সব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে।

অ্যান্টিজেনের বিশেষায়িত কিছু থাকে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইমিউনো সাড়া (immunogenicity) সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এরা অবশই non-self বা বহিরাগত বস্তু হবে। অধিকাংশই অ্যান্টিজেন প্রোটিনধর্মী ও জটিল গঠনবিশিষ্ট। এদের আণবিক ওজন সাধারণত ১০,০০০ ডাল্টনের অধিক। তবে অ্যান্টিজেন জটিল শর্করা অর্থাৎ বৃহদাকার পলিস্যাকারাইড বা বৃহদাকার লাইপোপ্রোটিন বা মিউকোপলিস্যাকারাইড বা গ্লাইকোপ্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিনও হতে পারে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত বা আবদ্ধ হতে পারে।

অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাকে এনিটোপ (enitope) বা অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট (antigentic determinant) বা নির্ধারক বলে। কোনো কোনো অ্যান্টিজেনধর্মী প্রোটিনের বা একটি অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপ থাকতে পারে। কখনো কখনো বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অণু (যেমন- নানা ধরনের ওষুধ, ধূলাবালির রাসায়নিক উপাদান, নানা ধরনের শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ, ত্বকের শুকনো আঁশের অপজাত পদার্থ, প্রাণীর খুশকিজাত পদার্থ প্রভৃতি) নিজে অ্যান্টিজেন না হলেও কোনো বৃহৎ প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনধর্মী হয়ে পড়ে ও অ্যান্টিবডির সঙ্গে আবদ্ধ হয়। এমন পদার্থকে বলা হয় হ্যাপ্টেন (hapten)। হ্যাপ্টেনগুলো বিশেষ প্রোটিনের ওপর এপিটোপ হিসেবে কাজ করে।

[বি:দ্র: রক্ত গ্রুপের (blood group) ক্ষেত্রে, লোহিত রক্তকণিকার আবরণীতে বিদ্যমান বংশগতভাবে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন পদার্থ, যা জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে । মানুষের রক্তে প্রধান তিন ধরনের অ্যান্টিজেন থাকে। যথা- A, B ও Rh]

অ্যান্টিজেনের বৈশিষ্ট্য

১। অ্যান্টিজেনের যে বিশেষ স্থানে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় তাকে অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক স্থান (antigentic determinant site) অথবা এপিটোপ (epitope) বলে। এপিটোপ নির্দিষ্ট রাসায়নিক গ্রুপ থাকে যার সঙ্গে অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট (antigen binding site) বা প্যারাটোপ (paratop) যুক্ত হয়।

২। অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থানগুলোকে অন্য কথায় ভ্যালেন্স (valence) বলে; বেশিরভাগ অ্যান্টিজেনের অনেকগুলো অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থান থাকে বলে এগুলোকে মালটিভ্যালেন্ট (mutivallent) বলে।

৩। অ্যান্টিজেনের দুটি বিশেষ ক্ষমতা থাকে, যেমন (i) অনাক্রম্যতাকরণ (immunogenecity)- নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের ক্ষমতা; ও (ii) বিক্রিয়াকরণ (reactivity)- উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়া করার ক্ষমতা। যেসব অ্যান্টিজেনের এই দুটি ক্ষমতা থাকে তাদের সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন (complete antigen) বলে।

অ্যান্টিজেনের উদাহরণ- সমগ্র অণুজীব (microbs), যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে; আবার অণুজীবের কয়েকটি উপাংশও অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। ব্যাকটেরিয়ার কোনো অংশ, যেমন- ফ্ল্যাজেলা, ক্যাপসিউল ও কোষ প্রাচীর অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যান্টিজেনধর্মী (antigenic)। ব্যাকটেরিয়াঘটিত অধিবিষ (bacterial toxins) তীব্র অ্যান্টিজেনধর্মী। অণুজীব ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, যেমন- ডিমের সাদা অংশ, ফুলের রেণু, গ্রহণ অযোগ্য রক্তকণিকা (incompatible blood cells), কলাকোষের এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রতিস্থাপন (transplantation) ইত্যাদি অ্যান্টিজেনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অ্যান্টিজেনের প্রকারভেদ- অ্যান্টিজেন দু'রকমের হয়। যথা- এক্সোজেনাস (Exogenous) ও এন্ডোজেনাস (Endogenous)।

১। এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন (Exogenous antigen)- যে সব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের বাইরে উৎপন্ন হয় তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন- পরাগ রেণু, দূষক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ইত্যাদি।

২। এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন (Enodogenous antigen)- যে সব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের ভিতরে উৎপন্ন হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন- ইঁদুর, বিড়াল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতির লোহিত কণিকায় অবস্থিত ফরম্যান অ্যান্টিজেন (foreman antigen) স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃদপিণ্ডে অবস্থিত কার্ডিওলিপিন (cardiolipin) অ্যান্টিজেন এই রকমের অ্যান্টিজেন। এই প্রকার অ্যান্টিজেন বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন-

ক. জেনোজেনিক অ্যান্টিজেন (Xenogenic antigen)- জাতিজনিগতভাবে পৃথক প্রজাতির দেহে যে সব সমপ্রকৃতির অ্যান্টিজেন দেখা যায় তাদের জেনোজেনিক অ্যান্টিজেন বলে।

খ. অটোলোগাস অ্যান্টিজেন (Autologus antigen)- বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন দেহ গঠনকারী কোনো উপাদান অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে তখন তাকে অটোলোগাস অ্যান্টিজেন বলে।

গ. অ্যালোজেনিক অ্যান্টিজেন (Allogenic antigen)- একই প্রজাতির দুটি প্রাণীর যে সব অ্যান্টিজেন জিনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু অ্যান্টিজেনিক ভিটামিন্যান্টস দ্বারা পরস্পরের থেকে পৃথক, তাদের অ্যালোজেনিক অ্যান্টিজেন বলে। এ ধরনের অ্যান্টিজেন লোহিত কণিকা, শ্বেতকণিকা, অণুচক্রিকা, সিরাম প্রোটিন প্রভৃতিতে থাকে।

অ্যান্টিজেনের সাধারণ ধর্ম (General properties of antigen)- অ্যান্টিজেনের প্রধান কয়েকটি ধর্ম হলো-

১। রাসায়নিক প্রকৃতি- অ্যান্টিজেন প্রধানত প্রোটিন। কিন্তু অ্যান্টিজেন পলিস্যাকারাইড ও লাইপ্রোপ্রোটিন জাতীয় হয়।

২। বহিরাগত ধর্ম- বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অ্যান্টিজেন সাধারণত বহিরাগত হয়।

৩। আণবিক ভর- কার্যকরী অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর সাধারণত 10,000 ডাল্টনের বেশি। সর্বাপেক্ষা ভালো অ্যান্টিজেনের আণবিক ভর মোটামুটি 10,000 ডাল্টন হওয়া প্রয়োজন। ইনসুলিনের আণবিক ভর 5000 D।

৪। উপলব্ধি ক্ষমতা- কোনো পদার্থকে অ্যান্টিজেন হতে হলে তার এমন কিছু গঠন বা ডিটারমিন্যান্ট গ্রুপ থাকা প্রয়োজন যা অনাক্রম্য তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান কর্তৃক চিহ্নিত হতে পারে।

৫। প্রজাতি নির্দিষ্টতা- একই প্রজাতির অন্তর্গত সব প্রাণীর কলাতে প্রজাতি নির্দিষ্টতা অ্যান্টিজেন থাকে।

৬। অঙ্গ নির্দিষ্টতা- নির্দিষ্ট কোনো কলা বা অঙ্গে অঙ্গ নির্দিষ্টতা অ্যান্টিজেন থাকে।

অ্যান্টিবডি (Antibody)

অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের বিপরীত বস্তু বা নিজস্ব বস্তু বা কণিকা বা কোষ অথবা কোষগুচ্ছ । অ্যান্টিবডি প্রধানত অ্যান্টিজেনের সাড়ায় দেহের B-লিম্ফোসাইট থেকে উৎপাদিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। এরা রক্তের প্লাজমা ও কলারসে বর্তমান থাকে। এরা অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত (combine) হতে পারে এবং ক্লোনাল নির্বাচন (colonal selection) দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং দেহের প্রধান সৈনিক বা রক্ষণাবেক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টিবডিগুলো অনুপ্রবেশকারী বা বহিরাগত অ্যান্টিজেনকে ভক্ষণ করে, কখনো বিনষ্ট করে, কখনো মেরে ফেলে, কখনো বাইরে নিক্ষেপ করে। অ্যান্টিজেন হচ্ছে non-self আর অ্যান্টিবডি হচ্ছে self বস্তু।

দেহের সব অ্যান্টিবডি গামা-গ্লোবিউলিন (γ-globulin) নামে পরিচিত। আর যেহেতু অ্যান্টিবডিসমূহ দেহের সুরক্ষার (immunity) কাজ করে তাই এদেরকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin, সংক্ষেপে-Ig) বলা হয়। এদের আণবিক ওজন ১,৫০,০০০-৯,০০,০০০/- ডাল্টনের মধ্যে সীমিত। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ২০% ইমিউনোগ্লোবিউলিন।

অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের গঠন (Structure of Antibody or Immunoglobulin) সকল প্রকার অ্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন লক্ষ করা যায়। গাঠনিক অংশগুলো নিম্নরূপ-

১। হালকা চেইন ও ভারী চেইন (Light and Heavy chains)- প্রতিটি অ্যান্টিবডি প্রধানত চারটি পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে দুটো দৈর্ঘ্যে ছোট (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ২০০-২২০টি অ্যামিনো এসিড থাকে) ও অপর দুটি আকারে বড় (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ৪০০-৪৫০টি অ্যামিনো এসিড থাকে)। ছোট পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে হালকা চেইন ও বড় পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে ভারী চেইন নামে অভিহিত করা হয়। হালকা ও ভারী চেইনের ওজন যথাক্রমে 23KD ও 50-70 KD (KD= KiloDaltons)।

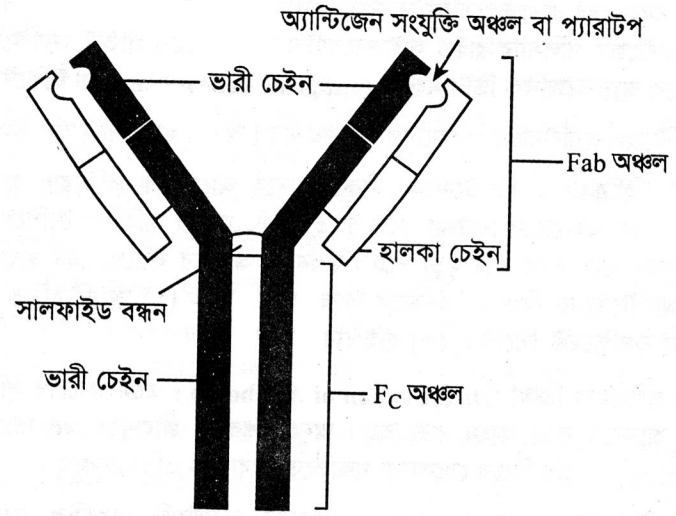

চিত্র ১০.৫.১: একটি অ্যান্টিবডির গঠন

কোনো কোনো অ্যান্টিবডির চারটির বেশি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলও থাকতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারী চেইনের প্রান্তে একটি হালকা চেইন সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং এভাবে প্রান্তদেশে অন্তত দুইটি হালকা ও ভারী উভয় ধরনের জোড়া তৈরি হয়।

২। ডাইসালফাইড বন্ধন (Disulfide bond)- পলিপেপটাইড চেইন শৃঙ্খলগুলো পরস্পরের সাথে ডাইসালফাইড বন্ধন (s-s) দ্বারা যুক্ত হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে Y-আকৃতির অ্যান্টিবডি গঠন সৃষ্টি করে। কখনো কখনো এই আকৃতি T-এর মতোও দেখা যায়।

৩। স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অংশ (Constant and variable region)- প্রতিটি ভারী চেইন ও হালকা চেইনের দুটি অংশ থাকে- একটি অপরিবর্তনশীল অংশ বা স্থায়ী অংশ এবং অপরটি পরিবর্তনশীল অংশ। পরিবর্তনশীল অংশ প্রতিটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং এই অংশেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির সংযুক্তি ঘটে। অ্যান্টিজেনের এ অংশটির নাম প্যারাটপ (paratope)। এটি তালা-চাবি (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে চাবি হচ্ছে প্যারাটপ, আর তালা অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

যেহেতু অধিকাংশ অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করার জন্য দুটি পরিবর্তনশীল অংশ আছে তাই এদের বাইভ্যালেন্ট (bivalent) বলে।

অ্যান্টিবডির প্রকার (Types of Antibody)- মানবদেহের রক্তে পাঁচ রকমের ইমিউনোগ্লোবিউলিন অর্থাৎ অ্যান্টিবডি দেখা যায়। যথা- IgG, IgA, IgM, IgD ও IgE । এগুলো মানবদেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঁচ প্রকার অ্যান্টিবডির মধ্যে IgG রক্তরসে সর্বাধিক মাত্রায় থাকে এবং IgD ও IgE সবচেয়ে কম পরিমাণে থাকে। এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-

১। IgG (Immunoglobulin-G): এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তেই বেশি থাকে, তবে লসিকা ও অন্ত্রেও পাওয়া যায়। মানুষের রক্তের সব ধরনের অ্যান্টিবডির প্রায় ৮০% IgG। এরা মনোমার হিসেবে থাকে। এর চারটি প্রকারভেদ আছে। যথা- IgG_1, IgG_2, IgG_3 ও IgG_4 । এরা সহজেই অমরাকে (placenta) অতিক্রম করতে পারে, ফলে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে একে ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিও (maternal antibody) বলে।

কাজঃ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে অপসোনাইজেশন (opsonisation) এর মাধ্যমে ধ্বংস করে। এগুলো বিষাক্ত পদার্থ (toxin) প্রশমনেও কাজ করে এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে (complement system) উদ্দীপিত করে দেহকে সুরক্ষিত রাখে।

২। IgM (Immunoglobulin-M): এরা সবচেয়ে বড় আকারের অ্যান্টিবডি এবং ভ্রূণের দেহে প্রথম সংশ্লেষিত হয়। রক্তে এরা পেন্টামার হিসেবে থাকে। এছাড়া এরা লসিকা এবং B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে অবস্থান করে। রক্তরসে এদের পরিমাণ প্রায় ৫-১০%। এর ২টি প্রকারভেদ আছে। যেমন- IgM_1 ও IgM_2।

কাজঃ এ ধরনের অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশন, ব্যাকটেরিওলাইসিস (bacteriolysis), কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন (complement fixation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে। এমনকি এরা ফ্যাগোসাইটোসিস ত্বরান্বিত করে এবং সব ধরনের অ্যান্টিবডির তুলনায় পরজীবী দমনে এরা অধিক কার্যকরী। অণুজীবের পলিস্যাকারাইড জাতীয় অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিশেষ কার্যকরী। রক্তে ABO গ্রুপের অ্যান্টি-A ও অ্যান্টি- B এবং জীবাণু প্রতিরোধে সংশ্লেষিত অ্যান্টিবডি IgM।

৩। IgA (Immunoglobulin-A): এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তে বেশি থাকে। এছাড়া ঘাম, অশ্রু, লালা ইত্যাদিতেও এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এরা মনোমার ও ডাইমার হিসেবে থাকে। অ্যান্টিবডির প্রায় ১০-১৫% এই প্রকার। মিউকাস স্তরে এর ক্ষরণ ঘটে। সব ক্ষরিত দেহ তরলে এটি থাকে। তাই একে ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি (secretory antibdoy) বলে। এর ২টি প্রকারভেদ আছে। যেমন- IgG_1 ও IgG_2। মায়েদের কলোস্ট্রামেও IgA পাওয়া যায়।

কাজঃ মিউকাস স্তরে ক্ষরিত IgA দেহের অনাবৃত তলকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং জীবাণুকে পোষক দেহে প্রবেশে বাঁধা দেয়।

৪। IgD (Immunoglobulin-D): রক্তে এ জাতীয় অ্যান্টিবডি খুব কম পরিমাণে (০.২%) থাকে। এরা মনোমার হিসেব B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে সংলগ্ন থাকে।

কাজঃ এরা B-লিম্ফোসাইটের অ্যান্টিজেন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে এবং B-লিম্ফোসাইটকে উত্তেজিত করে অ্যান্টিবডি ক্ষরণে প্ররোচিত করে।

৫। IgE (Immunoglobulin-E): রক্তরসে বেশ অল্প পরিমাণে (০.১%) থাকে। এরা মনোমার অবস্থায় মাস্ট কোষ ও বেসোফিল শ্বেতকণিকার পর্দার ওপর সংলগ্ন থাকে।

কাজঃ কৃমিজাতীয় পরজীবী নিষ্কাশনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি থেকে দেহকে রক্ষা করে।

মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (Monoclonal antibody): যে সব অ্যান্টিবডি এক প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।

পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি (polyclonal antibody): যে সব অ্যান্টিবডি বহু প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি (Function of Antibody or Immunoglobulin)- অ্যান্টিবডির প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। একটি অ্যান্টিবডি একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন বা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র কাজ করে থাকে। অ্যান্টিবডি নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পদ্ধতির সাহায্যে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু বা তার প্রতিবিষকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে-

১। দলবদ্ধকরণ বা স্তূপীভবন (Agglutination): এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি একাধিক অ্যান্টিজেনসম্পন্ন জীবাণুর অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের দলবদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়াকে অ্যাগ্লুটিনেশন বলে। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন যুক্ত কোষগুলোকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে তাদের অ্যাগ্লুটিনিন (agglutinin) বলে।

২। অধঃক্ষেপণ (Precipitation): এক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে অধঃক্ষিপ্ত করে, তাকে প্রেসিপিটিন (precipitine) বলে।

৩। অপসোনাইজেশন (Opsonization): অ্যাগ্লুটিনেশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি অণুজীবগুলোর ফ্যাগোসাইটোসিসকে আরো ত্বরান্বিত করে। ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য অণুজীবগুলোকে অ্যান্টিবডি যেভাবে সমর্থ বা যোগ্য করে তোলে তাকে অপসোনাইজেশন বলে। এর অ্যান্টিবডিকে অপসোনিন (Opsonin) বলে।

৪। বিশ্লিষ্টকরণ (Lysis): এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি সরাসরি জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্ন করে ফেলে।
৫। ব্যাকটেরিওলাইসিন (Bacteriolysin) : এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি দেহে প্রবেশকারী জীবাণুর কোষকে ধ্বংস করে। সংক্ষেপে অ্যান্টিবডির প্রধান কাজগুলো হলো- দেহে অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে; ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করতে সহায়তা করে; গর্ভকালীন সময়ে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; কিছু কিছু অ্যান্টিবডি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; কিছু অ্যান্টিবডি দেহে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের অনুপ্রবেশে বাঁধা দান করে; অনেক অ্যান্টিবডি আছে যেগুলো কৃমি ধ্বংস করতে সহায়তা করে; অপসোনাইজেশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে; এরা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির পার্থক্যগুলো লিখুন।

অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি

সারসংক্ষেপ

অ্যান্টিজেন হচ্ছে যেকোনো বিজাতীয় প্রোটিন বা পলিস্যাকারাইড, যা প্রাণিদেহে থাকে না। অ্যান্টিজেন শব্দটি Antibody generating এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যে সব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিজেন দু'রকমের হয়। যথা- এক্সোজেনাস (Exogenous) ও এন্ডোজেনাস (Endogenous)। এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন তিন রকমের। যথা- ক. জেনোজেনিক অ্যান্টিজেন খ. অটোলোগাস অ্যান্টিজেন গ. অ্যালোজেনিক অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের বিপরীত বস্তু self অর্থাৎ নিজস্ব বস্ত বা কণিকা বা কোষ অথবা কোষগুচ্ছ। অ্যান্টিবডি প্রধানত অ্যান্টিজেনের সাড়ায় দেহের B-লিম্ফোসাইট থেকে উৎপাদিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। এরা রক্তের প্লাজমা ও কলারসে বর্তমান থাকে। সকল প্রকার অ্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন লক্ষ করা যায়। গাঠনিক অংশগুলো নিম্নরূপ- ১। হালকা চেইন ও ভারী চেইন, ২। ডাইসালফাইড বন্ধন এবং ৩। স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অংশ। মানবদেহের রক্তে পাঁচ রকমের অ্যান্টিবডি দেখা যায়। যথা- IgG, IgA, IgM, IgD ও IgE।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। অ্যান্টিজেন কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। অ্যান্টিবডি জীবাণুকে ধ্বংস করে-

i. দলবদ্ধকরণ করে ii. ফ্যাগোসাইটোসিস iii. বিশ্লিষ্টকরণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। অ্যান্টিবডিগুলো হলো-

i. IgG ii. IgA iii. IgM

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার (Vaccine) ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	ভ্যাক্সিনেশন, ইপিআই, মেমরী কোষ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা

ভ্যাকসিন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ভ্যাকসিনাস (vaccinus) থেকে এসেছে যার আক্ষরিক অর্থ হলো from cow বা 'গরু থেকে প্রাপ্ত'। ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Janner) ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন। এর অনেক বছর পর লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। টিকা হলো প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন। টিকায় বিদ্যমান অণুজীবগুলো (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃতও হতে পারে। এদের এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করা হয় যাতে এরা জীবকোষে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে, কিন্তু রোগের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। অ্যান্টিবডি রোগের জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করে এবং স্থায়ী কার্যক্ষমতা নষ্ট করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিকা ভাইরাস থেকে তৈরি করা হয়।

সাধারণত কোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দিয়েই ওই রোগের টিকা তৈরি করা হয়। টিকা প্রবেশ করালে প্রাণিদেহে ওই একই জীবাণু বা নিকট সম্পর্কিত রোগ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। দেহে টিকা দেওয়া মানে হলো ওই রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশে করানো। কিন্তু যেহেতু এ জীবাণুগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে সেহেতু এরা জীবদেহে কোনো রোগ সৃষ্টি না করে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম্পস, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, টাইফয়েড, হেপাাইটিস ইত্যাদি রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু মরণব্যাধি এইডস (AIDS) এর ভাইরাস HIV কিংবা হেপাইটিস-সি ভাইরাসের প্রতিষেধক কোনো টিকা আজও আবিষ্কার হয়নি।

টিকার প্রকারভেদ

মানবদেহের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে দমন করতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কার করেছেন। এগুলো হলো-

১। নিষ্ক্রিয়কৃত জীবাণু জীবন্ত টিকা (Attenuated live vaccine)- কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেওয়া জীবিত জীবাণু নিয়ে তৈরি। উদাহরণ- BCG, হাম, মাম্পস, পোলিও, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, গুটিবসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

২। মৃত জীবাণুভিত্তিক নিষ্প্রাণ টিকা (killed vaccine)- এধরনের টিকা মৃত জীবাণু দিয়ে তৈরি। উদাহারণ- ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা প্রভৃতি ভ্যাকসিন।

৩। নিষ্ক্রিয় বিষভিত্তিক টিকা (Toxoid vaccine)- এ ধরনের টিকা জীবাণু নিঃসৃত টক্সয়েড দিয়ে তৈরি। উদাহরণ- ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

৪। দেহ তলের রাসায়নিক বস্ত (Surface chemical molecule)- অনেক ক্ষেত্রে সংক্রমণকারী জীবাণুর দেহ তল থেকে রাসায়নিক উপাদান (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) আলাদা করে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। উদাহরণ- হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রভৃতি।

৫। ডিএনএ টিকা (DNA vaccine)- রিকমবিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে DNA ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়।

জীবাণুঘটিত রোগের ভ্যাকসিন, তাদের জীবাণু ও প্রকৃতি

জীবাণুঘটিত রোগ	জীবাণুর ধরন	ভ্যাকসিনের প্রকৃতি
১। যক্ষ্মা	ব্যাকটেরিয়া	BCG- শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
২। টাইফয়েড	ব্যাকটেরিয়া	টাইফয়েড ভ্যাকসিন হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৩। প্লেগ	ব্যাকটেরিয়া	প্লেগ ভ্যাকসিন হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৪। পোলিওমায়েলেটিস	ভাইরাস	পোলিও ভ্যাকসিন নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৫। হাম	ভাইরাস	মিজলস্ ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৬। রুবেলা	ভাইরাস	রুবেলা ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৭। মাম্পস	ভাইরাস	মাম্পস ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৮। ইনফ্লুয়েঞ্জা	ভাইরাস	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৯। পীতজ্বর	ভাইরাস	পীতজ্বর ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১০। জলাতঙ্ক	ভাইরাস	জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন-নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১১। ডিপথেরিয়া	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১২। টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১৩। কলেরা	ব্যাকটেরিয়া	কলেরা ভ্যাকসিন-মৃত অণুজীব

টিকা দেওয়া বা ভ্যাকসিনেশন (Vaccination)

ইমিউনিটি অর্জনের জন্য দেহের মধ্যে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পদ্ধতিতে টিকাকরণ বা ভ্যাকসিনেশন বলে।

টিকাকরণের নীতি (Priciples of Vaccination)- রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেহে প্রবেশ করিয়ে ইমিউনিটি গড়ে তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে সক্রিয় অনাক্রমীকরণের মাধ্যমে ইমিউনোলজিক্যাল মেমোরির (immunological memory) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রোগ সংক্রামক জীবাণু শরীরে প্রবশে করলে দেহ দ্রুততার সঙ্গে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে, দেহে প্রবিষ্ট ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিজেন নির্দিষ্ট T ও B-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মেমোরি সেল উৎপন্ন ভ্যাকসিনেশন প্রধানত অণুজীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন বিষ (toxins), যেমন- সাপের বিষ (snake venoun), মাকড়সার বিষ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়। জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভ্যাকসিনেশন আর কোনো কাজে আসে না। এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভ্যাকসিনেশন কতগুলো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভ্যাকসিনেশনের নীতিগুলো হলো-

১। ভ্যাকসিন বা টিকা মৃত বা নির্জীব জীবাণু অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় উপজাত সমন্বয়ে গঠিত।

২। নির্জীব জীবাণু ভ্যাকসিন হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হলে এটি বংশবৃদ্ধি করলেও কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড টিকা হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটি শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৩। ভ্যাকসিন প্রয়োগে যে ইমিউনিটি জাগে তা জীবনব্যাপী স্থায়িত্ব পায় না। তবে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ দ্বারা এর স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলা যায়। বুস্টার ডোজগুলো দীর্ঘস্থায়ী ইমিউনিটি বজায় রাখে।

৪। কোন পথে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হচ্ছে তার ওপর অনেক সময় ইমিউনিটি স্থায়ী হয়। যেমন- খাদ্যনালি সংক্রমণের ক্ষেত্রে খাদ্যনালির মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে স্থায়ী ফল প্রদান করে।

৫। অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগাতে যে সময় লাগে তা কোনো জীবাণুর ইনকিউবেশন সময়কালের চাইতে অনেক বেশি। এ কারণে দেহে রোগ জীবাণু সংক্রমণের পর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কারণ জলাতঙ্কের বেলায় ইনকিউবেশনকাল অতিশয় দীর্ঘ।

টিকা দেওয়ার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccination)

১। টিকা দেওয়ার ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়।

২। ভ্যাকসিন দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াদের প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩। টিকার মাধ্যমে যে সব রোগ- প্রতিরোধ করা হয় সে রকম কয়েকটি হলো- যক্ষ্মা, টিটেনাস, কলেরা, জলাতঙ্ক, হুপিংকাশি, গুটি বসন্ত, ডিপথেরিয়া, পোলিও, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি।

৪। টিকা দেওয়ার ফলে কৃত্রিম শক্তির ইমিউনিটি সৃষ্টি করা হয়।

বুস্টার ডোজ (Booster dose)
দেহে অধিক মাত্রায় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি এবং ইমিউনিটি সাধনের জন্য প্রাথমিক ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় তাকে বুস্টার ডোজ বলে।

একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য
১। সারা জীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে।
২। সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়।
৩। রোগের সংক্রমণ রোধ করে।
৪। খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়।
৫। মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে পরিবাহিত করে।
৬। সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

বাংলাদেশে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম (Vaccination Programme in Bangladesh)
রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকার আবিষ্কার এবং এর প্রচলন মানুষের জন্য আশীর্বাদ। টিকার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে নির্মূলের পূর্বে গুটি বসন্ত এককভাবে পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করেছে। ১৯৫০ সালে আবিষ্কৃত পোলিও ভ্যাকসিন এবং এর ব্যবহার দ্বারা বাংলাদেশ বর্তমানে পোলিও রোগ মুক্ত। এই টিকা বা ভ্যাকসিনের জন্যই রুবেলা, হাম, মাম্পস, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর (Expended Programe on Immounization -EPI) কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী ৬টি রোগ, যথা- যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, পোলিও এবং হাম-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলা ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। মা এবং শিশুকে টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য টিটেনাস টক্সেয়েড (tetanus toxoid) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।

ভ্যাকসিনেশনের জাতীয় কর্ম সূচিতে নিচের ছক অনুযায়ী টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে

বয়স কাল	**সুপারিশকৃত টিকা**	
জন্মের এক মাসের মধ্যে	BCG ও OPV-O	OPV-Oral Polio Vaccine
৬ সপ্তাহ বয়সে	DPT-I ও OPV-I	BCG = Bacillus Calmette Guerin
১০ সপ্তাহ বয়সে	DPT-II ও OPV-II	DPT= Diphtheria, Pertussis and Tetanus
১৪ সপ্তাহ বয়সে	DPT-III ও OPV-III	DT= Diphtheria and Tetanus
৯ মাস বয়সে	Measles vaccine	OPV-O= Zero dose
১৮ মাস বয়সে	DPT OPV (Booster dose)	OPV-1 = 1st dose
৫-৬ বছর	DT vaccine	BCG-1=1st dose
১০-১৬ বছর	TT vaccine	TT= Tetanus Toxoid

ইমিউনাইজেশন বা অনাক্রম্যতাসাধন পদ্ধতি (Methed of Immunization)

আগেই বলা হয়েছে অনাক্রম্যতা সাধনের ক্ষেত্রে শরীরে কোনো রোগের জীবাণু প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবডি প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়। তবে মানবদেহে দুটি পদ্ধতিতে ইমিউনিটি অর্জিত হতে পারে, যথা- সক্রিয়ভাবে ও পরোক্ষভাবে।

সক্রিয় ইমিউনিটি (Active immunity) মানুষের একটি সহজাত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা বলে, দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশের পর মানুষের রক্তের লিম্ফোসাইট সরাসরি অ্যান্টিবডি তৈরি বা কোষীয় সক্রিতায় জীবাণু ধ্বংস করতে পারে।

অপরদিকে, পরোক্ষ অনাক্রম্যতার (passive immunity) ক্ষেত্রে মানুষের দেহে বাইরে থেকে অ্যান্টিবডির প্রবেশ ঘটিয়ে রোগের জীবাণু নষ্ট করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মাতৃগর্ভে শিশু মায়ের রক্ত থেকে অ্যান্টিবডি পেয়ে রোগ জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। সুতরাং মাতৃগর্ভে শিশু অনাক্রম্যতার মাধ্যমে রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

কৃত্রিমভাবে মানুষ যখন ইমিউনিটি আনার চেষ্টা করে তখন সুস্থ মানুষের দেহে নিষ্ক্রিয় কোনো রোগ জীবাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে সক্রিয় অনাক্রম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে মানুষের রোগটি দেখা দেয় না (জীবাণু নিষ্ক্রিয় ধরনের বলে), উপরন্তু রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। তখন দেহে সক্রিয় কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করলেও তা অনায়াসে অ্যান্টিবডি উপস্থিতির জন্য বিনষ্ট হয় ও মানুষ রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

নিষ্ক্রিয় জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়ে যে ইমিউনিটি জাগানো হয় তাকে বলে ভ্যাকসিন বা (vacine) টিকা। আর এই পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্যাকসিনেশন (vaccination) বা টিকাকরণ।

দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষ বা মেমোরি কোষের ভূমিকা

কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে একবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর B-লিম্ফোসাইট এবং-T লিম্ফোসাইট উভয়েই স্মৃতিকোষ বা মেমোরি কোষ (memory cell) হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এসব মেমোরি কোষ (মেমোরি B কোষ ও মেমোরি T কোষ) শরীরকে একবার প্রতিহত করা জীবাণুকে চিনতে সাহায্য করে ফলে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে অতি দ্রুততার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে। দেহে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে মেমোরি T-কোষ অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না।

B-লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের ভূমিকা সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি হিউমোরাল ইমিউনিটির সঙ্গে জড়িত। T-লিম্ফোসাইটের মতো বহু রকমের B-লিম্ফোসাইট দেখা যায় এবং এদের মধ্যে প্রতিটি কোষই বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে সাড়া দিতে পারে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উপর্যুপরি বিভাজিত হয়ে একই রকমের অনেকগুলো লিম্ফোসাইট তৈরি করে। উপজাত কোষগুলোর বেশিরভাগই প্লাজমা কোষে রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট কোষগুলো মেমোরি কোষে (memory cell) রূপান্তরিত হয়।

মেমোরি কোষ অল্প মাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে। প্লাজমা কোষই অ্যান্টিবডির প্রধান উৎস। প্লাজমা কোষ প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে। দেখা গেছে, একটি সক্রিয় প্লাজমা কোষ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০০০ অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে। মেমোরি কোষগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন, এমনকি সারা জীবন ধরে থাকতে পারে। এই কোষের উপরিভাগ IgG অথবা IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি থাকে। কখনো অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে তা দ্রুত সাড়া জাগাতে পারে। এই সাড়া জাগানো প্রাথমিক অবস্থায় যেমন থাকে তা হতে অনেকগুণ বেশি হয়। এ কারণে কেউ যদি একবার কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পরবর্তীকালে ওই ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে সে খুব সহজেই রক্ষা পায়। এ কারণেই শিশু কালের কিছু রোগ যেমন- হাম, মাম্পস, চিকেন পক্স ইত্যাদি জীবনে একবারই হয়। ভ্যাকসিনেশন এই নীতির ভিত্তিতেই উদ্ভব হয়েছে।

মানবদেহের স্থায়ী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিশুকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণ ও শিশু মায়ের দেহ থেকে পরোক্ষভাবে মেমোরি কোষ পেয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের শব্দগুলোর পূর্ণরূপ লিখুন।		
OPV		OPV-1	
BCG		OPV-O	
DPT		BCG-1	
DT		TT	

সারসংক্ষেপ

টিকা হলো প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কার করেছেন। এগুলো হলো- ১। নিষ্ক্রিয়কৃত জীবাণু জীবন্ত টিকা, ২। মৃত জীবাণুভিত্তিক নিষ্প্রাণ টিকা, ৩। নিষ্ক্রিয় বিষভিত্তিক টিকা, ৪। দেহ তলের রাসায়নিক বস্তু ও ৫। ডিএনএ টিকা। ইমিউনিটি অর্জনের জন্য দেহের মধ্যে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পদ্ধতিতে টিকাকরণ বা ভ্যাকসিনেশন বলে। দেহে অধিক মাত্রায় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি এবং ইমিউনিটি সাধনের জন্য প্রাথমিক ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় তাকে বুস্টার ডোজ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। WHO কোন ছয়টি রোগের টিকা দেয়?

(ক) যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, পোলিও, হাম

(খ) কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম

(গ) টিটেনাস, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, পোলিও হাম

(ঘ) হেপাটাইটিস-বি, কলেরা, যক্ষ্মা, টিটেনাস, পোলিও, হাম।

২। রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে একবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর নিচের কোষগুলো মেমোরি কোষ হিসেবে কাজ করে–

i. B- লিম্ফোসাইট

ii. ii. T-লিম্ফোসাইট

iii. iii. IgA অ্যান্টিবডি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রাকৃতিকভাবে এক ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন হয়, যা নির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে দেহকে রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

ক. স্টেম কোষ কী?

খ. কোষ নিয়ন্ত্রিত ইমিউনিটি বলতে কী বুঝেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্লাইকোপ্রোটিনের গঠন বর্ণনা করুন।

ঘ. রোগ জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রোটিন জীবের জন্য গুরুত্বপূর্ণ- বিশ্লেষণ করুন।

২। বিভিন্ন জীবাণু সংক্রমন হতে রক্ষার জন্য মানবদেহে ৩টি প্রতিরক্ষা স্তর রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক. ইন্টারফেরন কী?

খ. সক্রিয় ইমিউনিটি ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখুন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরটি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্বিতীয় স্তরটিতে ফ্যাগোসাইটিক কোষের ভূমিকা অনন্য- বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ :	১. ক	২.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ :	১. ক	২.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ :	১. গ	২.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ :	১. ক	২.ঘ	৩.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ :	১. ক	২.ক	